# পাঠকের হাসান আজিজুল হক

রানা মুখোপাধ্যায়

(আলোচ্য গ্রন্থ হাসান আজিজুল হকের 'ফিরে যাই ফিরে আসি' ও 'চলচিত্রের খুঁটিনাটি')

চরিত্রের সন্ধানে কিংবা কাহিনীর সন্ধানে না গিয়ে কোনো লেখক খুব কাছে থেকে মানুষে নজর করতে চাইছেন এ ঘটনা ইদানীংকালে একেবারেই বিরল, যখন প্রযুক্তির প্রযত্নে পাখির চোখে জীবন দেখাটা দস্তুর হয়ে গেছে। হাসান আজিজুল হক সেরকমই একজন অন্যতম বিরলতম ব্যক্তিত্ব যিনি লিপিকারও। সেই লেখকেরই বারে বারে ফিরে যাওয়া, ফিরে আসা, অতীতের দিকে যখন একই ভূখণ্ডের দৈশিক দিকচিহ্ন বিশিষ্টতা পায় নি, যখন মানুষ সীমানাবদ্ধ হয়ে এপার অথবা ওপার আখ্যা পায় নি। লেখকের ফিরে যাওয়া নেহাৎই পোষাকি নয়, কারণ তিনি রাজনৈতিক মতামতে মধ্যপন্থি নন, কিংবা উগ্রতা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রাখে না, বরং তিনি প্রশ্ন করেন, সাইকেল চেপে অথবা পায়ে হেঁটে গ্রামের পথে ঘুরে বেড়ান। তাই রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বক্তৃতা এই মত প্রকাশ করায় যে, 'ধর্মব্যবস্থার উপরে ভিত্তি করে কোনো দেশে শিক্ষা বা আইনব্যবস্থা প্রণয়ন করা উচিত নয়।' তাঁকে জমায়েতের ইসলামী ছাত্র শিবিরের রোষের মুখে পড়তে হয়েছে। 'শিবিরের কর্মীরা তার বক্তব্যের কারণে তাকে কেটে বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দেয়ার হুমকি দিয়েছে'। (উৎস ঃ শোহেইল মতাহির চৌধুরী তারিখ ঃ শনি, ২০০৬-০৮-২৬ ০৫:১৮) সমস্ত পৃথিবীতেই এইরকম অন্ধকারের দিকে মানুষকে নিক্ষেপ করার প্রবণতা চালু রিয়েছে। খুব সাম্প্রতিককালে পাকিস্তানের সোয়াট উপত্যকায় অন্ধকারের এরকম আরাধনা শুরু হয়েছে। এই অন্ধকারের উপাসকেরা কিন্তু মানবতার পক্ষীয়দের আন্দোলিত করতে পারে না। মুক্তমনার ইন্টারনেট পত্রিকায় বলা হয়েছে 'Recently, in bangladesh, Islami chatra shibir, the militant student wing of jomaat -e -islami-a coalition partner in the country. The two individuals, Hasan azizul Haque - a professor of Philisophy at the Rajshahi University and a revered litterater - and prof, Zafar Iqbal (Also a popular writer) at the shajjalal University of science and Technology have been issued death threats in their attempts at teaching the values of secularism, democracy and science to youth make them nastik - murtads or filthy atheists if one wants a literal translation. That a student orga nization could issue such a condemanation of two reputable academicians is regrettable in itself, the worst part in this that the two profssors have been warned in graphic detail that their tongues would be cut out, that they would have their throats slit etc. The jamaat - e Islami is not a organization without its supporters outside Bangladesh,' কিন্তু এহ বাহ্য, এর পরের কথাটা আরও সাঙ্ঘাতিক, 'It is ironic that Mr. Richard Boucher - US Assistant Secretary of State of South and Central Asian Affaairs - has certified the same fascist Jamaat-e Islami as a 'democractic party' (Ref. http:www.mijto-mona.com / articles/Jahed/shibir_threats.htm) during his recent trip to Dhaka at a time when US is Known to be at a war on terror worldwide.' (পাঠক, আমরা ভুলে যাই নি আফগানিস্থানের বামিয়ানে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসসাধনের সময় সাগরপার থেকে একটাও প্রতিবাদি বাক্য ভেসে আসে নি।) এ প্রসঙ্গে হাসান আজিজুল হকের লেখা একটি বক্তিগত পত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। তারিখ - ২৬.১০.২০০১ -এ শ্রী সুশীল সাহাকে লেখা। সে পত্রে হাসান সাহেব লিখছেন, 'নির্বাচনের পরে আমাদের গণতন্ত্র, এই হিংসা চলে যাবে, '...দীপ্যমান হয়ে উঠবে মানুষের ভালোবাসার মুকুট।' এবং তার উপসংহার হল এই যে, 'ক্ষতবিক্ষত শরীর, রক্তাক্ত মৃত্যু কামনা করিনা, কিন্তু মানুষের জন্য কাজে করতে গিয়ে তাই যদি চাপিয়ে দেওয়া হয় কি করব?' তাই তাঁর উপন্যাসের কেন্দ্রিয় চরিত্র, একজন অল্প শিক্ষিত গৃহবধূ, সমস্ত পারিবারিক সিদ্ধান্তের বিপীতে অনড়তায় প্রতিবাদ ব্যক্ত করেন। আমরা লেখকের পথরেখা ধরে হেঁটে যাই অজানার দিকে। এ প্রসঙ্গে নিবেদন করা যায় যে, এ লেখার ভিত্তিভূমি হচ্ছে পাঠ প্রতিক্রিয়া।

বর্ধমান আর কাটোয়ার মধ্যবর্তী রেলস্টেশন নিগণ। সেখানেই লেখকের ফিরে যাওয়া। আমরা শুধু অনুসারি মাত্র। রাঢ় বঙ্গের ধুলোময় প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়ার এক অদ্ভুত বিবরণ সারা বই জুড়ে। আর এখানে উল্লেখ্য যে আগুনপাখির সঙ্গে বর্তমান বইটির অদ্ভুত মিল। এও আর এক স্মৃতিকথা নিশ্চয়। চারপাশে হিন্দুদের ঘেরা গ্রামের মাঝখানে একটা গ্রাম মুসলমানদের। আজিজুল হক - এর জন্মদিন স্থিরীকরণের মধ্য দিয়েই বইএর মুখবন্ধ। যে জন্মদিনটা তাঁর বাবা স্থির করে দিয়েছিলেন বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার সময়, তা ছিল ১৯৩৯ এর ৩রা সেপ্টেম্বর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিন সেটি। যুদ্ধ শুরুতেই যাঁর জন্ম তাঁর ভবিতব্যে নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল মানবতাবাদিতা। অথচস্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় জন্মদিনটা লিখে দেওয়া হয় ২/২/১৯৩৯।

১৯৫৪ -এই বর্ধমানের যবগ্রামে কাশীশ্বরী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস। এই জীবনী থেকে একথা অন্তত বোঝা যয় যে ব্যক্তিগত জীবনে এবং লেখায়ও তিনি কলমকে মাটিলগ্ন করে মানুষের দিকে নুইয়ে রেখেছেন। তবে লেখকের ভুমিকা নিয়ে প্রশ্ন তিনি তুলেছেন। সাধারণত আমাদের সমাজে লেখক অথবা শিল্পীকে বিনোদক হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু হাসান আজিজুল হক প্রশ্ন তুলেছিলেন বহুদিন আগে, 'লেখকরা শুধু ভাড়াটে ভাঁড় নয় যে তাঁরা পাঠককে শুধু আমোদ বিক্রি করবেন।' এই প্রশ্নের অন্দরেই রয়ে যায় তাঁর লিখিত সত্তার আন্তরিক বিবৃতি। মানুষের প্রতি এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা কিন্তু তাঁর মা। পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া উত্তরাধিকার তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর স্বামীর একান্নবর্তী পরিবারে। তাঁর বাবারও একটা সামাজিক নিমগ্নতা ছিল। আর তার পাঠাভ্যাস গড়ে উঠেছিল তাঁর বাড়িতেই একেবারে শৈশবে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও বিভিন্ন লেখকের সঙ্গে পরিচিতি তাঁর শৈশবেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫৬ সালে দৌলতপুর কলেজে পড়াকালীন রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। এই রাজনীতিই তাঁর জন্য নিয়ে এসেছিল চরম নিগ্রহ, এমনকি তাঁর মেধাবৃত্তিও কলেজের অধ্যক্ষ ফাইলচাপা দিয়ে রেখে কার্যত তাঁকে কলেজ ত্যাগে বাধ্য করেন। এর পরে, ১৯৬০ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত তিনি রাজশাহী সিটি কলেজ, সিরাজগঞ্জ কলেজ খুলনা গার্লস কলেজ এবং দৌলতপুর ব্রজলাল কলেজে অধ্যাপনা করেন। ১৯৭৩ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য খান সারওয়ার মুরশিদ নিজে উদ্যোগী হয়ে তাঁকে রাজশাহী নিয়ে আসেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন হাসান আজিজুল হক। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৪ সাল পর্যন্ত টানা ৩১ বছর অধ্যাপনা করেন তিনি।

এত গেল তাঁর কর্মজীবন। তাঁর সাহিত্যজীবনের বিপুল পরিধি। আমরা আপাতত ফিরে যাবো রাঢ় বঙ্গে যেখানে লেখকের ফিরে যাওয়া আবার ফিরে আসাও বটে, কারণ গতি তখন দ্বিমুখী, যদিও লেখকের সাহিত্যজীবন মাঝে মাঝে এসে যাবে। রাঢ় বঙ্গের স্মৃতিচারণে লেখকের প্রাকৃতিক অনুরক্তি তথা অনুভূতির বিপুলতায় গৌণ হয়ে যায় ব্যক্তিগত ঘটনা পরম্পরা। তবুও ঔপন্যাসিক তো, একটা কাহিনীর অভিমুখ থেকেই যায়। সেখানে মুখ্য ভূমিকা প্রকৃতি নিলেও মানুষও এসেছে গভীর আন্তরিকতায়। পাঠকালীন অনুভূতির

উত্তরণ এক মানবতাবোধে যা, অবশ্যই, লেখক অনুপ্রাণিত।

'ফিরে যাই ফিরে আসি' মনে হয় লেখকের আত্মজীবনীর প্রস্তাবনা। এই বইয়ে তাঁর শৈশবই যেন প্রতিভাত হয় আমাদের সামনে। আর সেই শৈশবের বিস্তৃতিতেই এই জগতের কাছে আত্মনিবেদন করা এক তীব্র অনুসন্ধিৎসায়। কোনো সামান্য ঘটনাংশই উপেক্ষিত হয় না। বরং নিবিড় দর্শনে তা হঠে নান্দনিক, হৃদয়গ্রাহি। আমরা এ লেখায় কিছুটা উল্লেখ করেছি গ্রামের প্রকৃতি সম্পর্কে। রাঢ় বাংলায় ছায়া বিরল রুক্ষ একটা দরিদ্র গ্রাম যবগ্রাম। এতই গুরুত্বহীন যে, ইতিহাসেও খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। তবু লেখকের বিবরণ ধরে আমরা জগত জোড়া জালে সেই গ্রামকে খুঁজতে গিয়ে পেয়েছি তার পোস্টাপিসের সংখ্যাতত্ত্ব মাত্র। বর্ধমান কাটোয়া মার্টিন কোম্পানীর ছোটো লাইনের একটি অখ্যাত ছোট্ট রেলস্টেশন নিগণ, যা আমরা ভারতীয় রেলস্টেশনের তালিকায় খুঁজে পাইনি। সেই রেলস্টেশন থেকে এক ক্রোশ পূর্বে যবগ্রাম। আসা যাওয়ার একটাই পথ। একটা কাঁচা সড়ক। এদিক ওদিক ঘুরে তবে গ্রামে পৌঁছয়।

এই গ্রামের বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক প্রথমেই উল্লেখ করেন অন্তহীন পথের কথা। সরু মাটির রাস্তা, গাছতলা দিয়ে অথবা পুকুর পাড় ধরে চলা। আর তালগাছের ভিতর দিয়ে দৃশ্যমান লাল টকটকে সূর্য আর তার কাঁচা রোদ। গ্রামের শেষ বাড়িটি লেখকদের। এই গ্রাঁমে কোনো প্রাচুর্য নেই, নেই কোনো উল্লেখযোগ্যতা। গ্রামের প্রকৃতির মধ্যেও সেই রিক্ততার ছাপ। গ্রামবাসীদের জীবনেও তা প্রতিফলিত। খাওয়া বলতে শুধু ভাত আর ডাল। আর ডালেরও প্রকারভেদ আর্থিক অবস্থার প্রেক্ষিতে। গাঁয়ের আশেপাশের জমিতে ফলে মসুর, মুগ, মাষকলাই, আবার আইড়ি তেওড়া প্রভৃতিও হয়।

মোটকথা ডাল সবাই খায় তা ঘনই হোক অথবা পাতলা। খাদ্যের একটি আবশ্যক পদ হল ডাল। তার সঙ্গে থাকে বিভিন্ন সব্জি মেশানো ঘ্যাঁট। তা বলে, মাছ, মাংস নেই। পুকুর দীঘিতে রুই, কাতলা, মিরিক বড় বড় থাকে বটে কিন্তু তাতে সাধারণ মানুষের অধিকার কোথায়। হিন্দু পাড়ার লোকেরা বছরে একদিন মাংস খায় কিনা সন্দেহ। মুসলমানরা গোমাংস খায় বলে খেতে পায় কদাচিৎ। তবে সে অবশ্য বকরিদ জাতীয় উৎসবে। মুসলমানদের বরাতে ডিম আর মুরগিটা জোটে আর হিন্দুরা লুকিয়ে ডিম মুরগি সাবাড় করে। তবে উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা কদাচিৎ ঘটে থাকে। প্রাত্যহিক খাদ্য বলতে ভাত আর ডাল। আসলে ধান থেকে যা হয় সবই এক গ্রামের মূল খাদ্য। কারণ ধান ছাড়া এখানে খুব একটা কিছু হয় না। সবুজ আর সোনালি রঙের দিগন্তে এই দুনিয়ার শুধু ধান। আর এই দেশের মাটি একেবারেই ধেনো শুষ্কতায় ছাইসাদা আর ভিজলে কালো। 'এঁটেল মাটির দেশ। আর পথ তাই কাদাময়, হাঁটু ডোবা, কোমর ডোবা, মুখ বন্ধ, ঠোঁট পেটা কাদা। আজ পাড়াগাঁ এই যবগ্রাম। এই গ্রাম ছেড়ে কেউ কোথাও বিশেষ যায় না। ছোটোবেলায় জীবযাপনে কৃচ্ছ্রসাধনে অভ্যস্ত হওয়ার একটা উদাহরণ নিকারবোকার আর শক্ত হয়ে যাওয়া জুতো।

গ্রামের মানুষ যাই কিনুক বেচে শুধু ধান। ধানই তাদের একমাত্র সম্বল। ধান বেচতে কারুরই ইচ্ছা করে না, কিন্তু না বেচে উপায় কি? আলু, বেগুন, কুমড়ো, শসা সংসারে সবইতো লেগে যায়। আর তাছাড়া সেগুলো বেচেই বা লাভ হয় কত টাকা। টাকা আর কটা লোকে চোখে দেখে। সত্যি বলতে কি গ্রামের কারুর কাছেই টাকা থাকে না। এক টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা, আর রুপোর আধুলি, সিকি দুআনি, আর পয়সার খুচরোতেই কাজ চলে যায়, একশো টাকা কজন চোখে দেখতে পায়। মহাজনের আড়তে থাকা অবশ্য টাকা। থাক দেওয়া মহাজনের জমে ওঠা ধান দুদিন পরেই উধাও। এক দানাও পড়ে থাকে না পাখি পাখালির জন্য। চালান হয়ে যায় মালগাড়িতে। ধানবেচা চাষি এক আনার ফুলুরি আর এক গ্লাস জল খেয়ে দারুণ খিদে চাপা দেয়। ফসল যে ফলায় আর ফসল যে কেনে তাদের দুয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান আর্থিক প্রেক্ষিতে। এ বিবরণের বিশ্লেষণ আমরা দেখাবো আর পরে এই লেখায় অন্য সামাজিক প্রাসঙ্গিকতায়।

এই গ্রামে কিন্তু কুমোর, ছুতোর, ধোপা নেই। আছে শুধু কামারবাড়ি। কামারবাড়ির উপর গ্রাম অত্যন্ত নির্ভরশীল, কারণ লাঙলের ঈশ, গরুর গাড়ির চাকায় লোহার হাল পরানো এসব ছাড়া গ্রাম চলে কি করে। কম বেশি জমি সবারই তো আছে। কাজে কাজেই কণ্ঠ কামার বেশ উল্লেখযোগ্যতায় উজ্জ্বল। হাপরের আগুনে পুড়ে পুড়ে কণ্ঠ কামারের শরীরটা ফিনফিনে ইস্পাতের পাত। কণ্ঠ কামার মরে যাবার পরে অবশ্য পাশের গাঁয়ে কামারশালে যেতে হয়েছিল অনেককে। কিন্তু ঠাকুর গড়বে কে। দুর্গা, কালী, সরস্বতী গড়তে কুমার আসতো গিধগাঁ থেকে। মাটির কড়ি, কলসি, তৈজসপত্র কিনে আনা হত হাট থেকে। গাঁয়ে একমাত্র ছুতোর ছিল হালিমের বাপ। কিন্তু সে টুকটুক কাজের বাইরে যেতে পারতো না। তাই প্রয়োজন মেটাতে পাশের গাঁয়ে যেতে হত ছুতোর ডাকতে। স্যাকরার জন্য শহরে যেতেই হত। সেদিক দিয়ে ধোপার দরকার প্রায় ছিলই না। গ্রামেতে যাদের অবস্থা ভালো তারা তারা সাবান আর অসচ্ছল লোকেরা সাজিমাটি দিয়ে কাজ চালিয়ে নিত।

গ্রামের উৎসব বলতে হিন্দুদের কালী পুজো, যোগদ্যা পুজো আর মুসলমানদের ঈদ, বকরিদ আর মাদার নাচানো। যোগদ্যা পুজোয় নেশাগ্রস্ত বাসুকামারের এক কোপে পশুর ধড় থেকে মাথা নামিয়ে দেওয়া আর মাদার নাচানোয় কুদু আর কিবিরিয়ার কেরামতি। বলির সময় বাসুকামার আর মাদার নাচানোর সময় কুদু আর কিবরিয়া। যখন বাসু কামারের খাঁড়া চলে তখন কার সাধ্য লাল চোখে বাসু কামারের কাছে পৌঁছয় আর কিরবিয়া যখন মাদার নাচায় সে একটা ব্যাপার বটে। মাদার আসলে বাঁশ, গাঁটহীন, সরু লিকলিকে বাঁশ। খেপে যে মাদার। কিবরিয়ার কোমরে বেল্টের গোল গর্তে বসানো মাদার যখন খেপে তখন কিবিরিয়াকে ধরে রাখা মুশকিল। মাটিতে নাক মুখ ঘষে, মুখের চামড়া উঠিয়ে বাড়ির গিন্নীর কাছ থেকে আড়াই সের দুধকলমা চাল, দু সের আলু, আধসের সরসের তেল, আর একখানা মোরগ বাগিয়ে তবেই ক্ষান্ত দেয় কিবরিয়া। আবার মহরমের সময় সে চামড়ার মোটা ফিতে দিয়ে তৈরি চাবুক দিয়ে নিজের পিঠে বাড়ি দিয়ে রক্ত বের করে ফেলে। আর খেলা শেষ হয়ে যখন গান শুরু করে সে তখন মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। ঠিক একইভাবে মোষের ধড় থেকে খাঁড়ার কোপে মুণ্ডু ছিটকে দিয়ে বাসু কামার যাত্রার রিহের্সাল দিতে যায়। ধর্মীয় আচরণের সংস্কৃতির সাযুজ্য লক্ষণীয়। আসলে সবি দেখা। লেখকের ভাষায়, 'খাঁড়া যখন পাঁঠা দুখণ্ড করছে, মা কালী নড়ে উঠছে কি না দেখি, শবেকদরের জ্যোৎস্না ভরা মাঝরাতে জানালার ধারে বসে দেখি কখন গাছপালা সারা দুনিয়ার আল্লাকে সেজদা করে। দেখতে পাই আর না পাই সব দেখাই মজার।'

এহেন প্রকৃতিতেই লেখকের বেড়ে ওঠা। তাঁর পারিবারিক চৌহদ্দির যে বিবরণ তা হুবহু মিলে যায় আগুনপাখিতে বর্ণিত পারিবারিক অবস্থার সঙ্গে। তাঁর বাবার লোহার চেয়ার, তাঁর ফুফুর পরিবার মগ্নতা, তাঁর মায়ের আত্মনিবেদন অবশ্যই সংসারের কাছে একেবারে প্রায় অবিকৃতভাবে চলে আসে লেখায়, পরিবারে বাবাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। বয়সে ছোটো হলেও পরিবারে তাঁর সিদ্ধান্তই মেনে নেয় সবাই। এমনকি তাঁর দাদা যাঁকে ছোটোরা বলে বড়বাবা তিনিও। সে দেখাও চলে আসে আন্তরিকভাবে। প্রকৃতির কাছে আত্মনিবেদনও এ বইএর আর একটা বড় পাওয়া, মানুষের খাদ্যান্বেষণের সঙ্গে যার বিপুল মিল। আবার সাধারণ মানুষের জীবনধারণের ধারাও তার সঙ্গে মিলে যায় যখন বিকল্প বাছবার কোনো সুযোগই নেই। তাই খাই খাই করে খালি মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়ানো। এ যেন একটা হতশ্রী অকিঞ্চন গ্রামেরই প্রতিচ্ছবি মাত্র। প্রাচুর্য নেই, সবুজহীন চারিদিক। এক হাঁটু ধুলোর মধ্য দিয়ে চলতে চলতে সেই বোধ যেন আচ্ছন্ন করে রাখে লেখকের শৈশবকে। সেই শৈশবের বিবরণেও ধরা পড়ে গ্রামেরই রূপ। ছোটোবেলায় মরতে মরতে বেঁচে ওঠা বালকটি জীবনের আস্বাদ নিতে চায় বুক ভরে। এই বই - এর প্রতিছত্রে তারই প্রতিবেদন। গ্রামের প্রকৃতি থেকে গরুর

গাড়ির চাকায় লোহার পাত লাগানো অথবা শেয়ালের পিছনে ছুটে যাওয়া কিংবা মাঠে মাঠে ফসলের শিষ কুড়িয়ে বেড়ানো — সব কিছুতেই অনুসন্ধানী ঔৎসুক্য। তা বলে ছোটোবেলা একেবারে মসৃণ ছিল না। কৃচ্ছ্রতাসাধন কিরকম ছিল তাঁর শৈশবে তার একটা প্রমাণ নিকারবোকার আর সযত্নে রক্ষিত জুতোজোড়াটি যেগুলি ব্যবহৃত হত শুধুমাত্র নিমন্ত্রণ রক্ষার ক্ষেত্রেই। ছোটো হয়ে যাওয়া নিকারবোকার আর শক্ত হয়ে যাওয়া জুতোজোড়া পরতে গিয়ে কপালে জুটত অবিরাম নিগ্রহ। তবুও শৈশব তার রোমাঞ্চ হারায় নি। তাই পরিণত বয়সে স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে সেই শৈশব আসে প্রাণিত ভাবে।

সেই প্রাণের স্পন্দন দেখা যায় শিক্ষাচর্চা শুরু হওয়ার মধ্যেই। শিক্ষার শুরু রণ মাস্টারের পাঠশালায়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাড়িতে একরকম পেটভাতে বিনা মাইনের ওস্তাদজি থাকতেও বালকের শিক্ষাশুরু হয়েছিল রণ মাস্টারের পাঠশালায়। হয়ত, পিতৃদেবের উদ্দেশ্য ছিল যে, লেখাপড়াটা যাতে পরিপূর্ণভাবে মাতৃভাষায় শুরু হয় কারণ ওস্তাদজি বাংলার সঙ্গে উর্দুও শেখাতেন। শিক্ষা শুরু করতে যাওয়া বালকের চোখ এড়িয়ে যায় নি কালো গাঁট্টাগোট্টা মানুষের গালভরা হাসিতে কুঁচকে থাকা চোখ দুটি। চাদরের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাওয়া যায় মোটা ধুলোয় কালো একগোছ পৈতে। নরম ভারি গলার মানুষটিকে খারাপ লাগেনি শিক্ষার্থীদের। মাঠ পেরিয়ে পাঠশালার পথ। মাঠের শেষে খাল আর খাল পেরোলেই বিরাট পাকুড়তলার দিঘি - ঘাট। শীতের সকালে পাঠশালা যাবার পথে মাঠে ঘন কুয়াশা ছিল আজো মনে পড়ে। রণ মাস্টারের পাঠশালা দত্ত মশায়ের বৈঠকখানার পাশে। রণ মাস্টার আর পাঠশালা চালাতে না পেরে যোগ দেন দাশু মাস্টারের সঙ্গে। দাশু মাস্টারের পাঠশালা একেবারে পুজো মণ্ডপের সামনে একটা খোলা চাতালে, মাথার উপর খড়ের ছাত। পুজো মণ্ডপে খড়ের কালীমূর্তি, আর তাঁর পায়ের নীচে মাথাহীন মহাদেব। ক্লাস ওয়ান থেকে ফোর। তবে খোলা চাতালে শুধু ওয়ান টুর ক্লাশ হত আর থ্রি - ফোরের ক্লাশ হত একটা পুরোনো মাটির বাড়িতে। শ্লেট আর বই মায়ের পুরনো শাড়ি ছিঁড়ে বেঁধে দপ্তর, লেখা তালপাতা গুছিয়ে বেঁধে মাটির বাড়িতে। ছেড়া কাপড় ভিজিয়ে নেওয়া শ্লেট মোছার জন্য। আসন বলতে শুকনো পাতার গদি, খলপা। বই - বর্ণপরিচয় - রাখাল বালকের গল্প আর ইংরাজি -ও মেরী গো অ্যাণ্ড কল দি ক্যাটস হোম ইত্যাদি। সহপাঠিদের বিবরণও আছে। সর্দার পড়ুয়া বলা, যে প্রায় পাঠশালায় পড়তে আসা সব ছাত্রেরই সহপাঠি।

সেই শেখায় এমন পাঠ যা জীবনে ভোলা হয় না। আছে সেই ফুটফুটে ছেলেটার কথা যাকে কোলে করে পাঠশালায় নিয়ে আসতে হয়। পাঠশালায় পড়তে আসা ছেলেগুলোর ময়লা প্যান্ট, খালি গা, কেউবা গেঞ্জি, ফতুয়া অথবা হাফশার্ট। পড়া ছাড়া খেলা বলতে কড়ি খেলা আর বনবাদাড় পিটিয়ে ফেরা, শেয়ালের পিছনে দৌড়নো, গোসাপ মারা।

এই সময়েই মীরার আত্মহত্যা। অনেকগুলি সন্তানের একজন মীরা, যার আবেদন একটু অন্যভাবে এসেছিল বালকের কাছে। মীরার বাড়িতে বালকের গলা জড়িয়ে ধরে ঠোঁটে স্পর্শ এঁকে দেওয়া। এ সব সুদুর স্মৃতিপথে। কিন্তু দাগ কেটে যায় দাদীর মৃত্যু। বালকের প্রথম মৃত্যু দর্শন। এমন একটা সময় যে, একটু তো দাগ রেখে যায় বান্ধবীর মৃত্যু। তবে এই শেষ নয়। এর পরের মৃত্যু আরও কাছ থেকে দেখা। দাদির প্রাণবিয়োগোত্তর অবস্থা বালকের স্মৃতিস্থ। যদিও মনে পড়ে না আদৌ শেষযাত্রায় যাওয়া হয়েছিল কিনা। তবুও কবরের স্মৃতি মনে একেবারে উজ্জ্বল। দাদির যে মৃত্যু হতে পারে এমন ধারণাও কখনও আসেনি। কারণ বেঁচে থাকা মানুষ মরে কি করে আর মরলেই বা যায় কোথায়। কবরটা দেখতে দেখতে ছোটো কুঁড়ে ঘর। মাটি আর জল মিশিয়ে তৈরি সেই ঘরটার মাথায় বসিয়ে দেওয়া হল খেজুর ডাল। কিন্তু দাদির জায়গাতো ফাঁকা থাকতে পারে না, তাই ফুফু হয়ে উঠল দাদি। দশ বছর আগে বিধবা হয়ে আসা ফুফু আর ফিরে যায় নি। আমাদের তৎকালীন সমাজের সবচেয়ে অবহেলিত বাল্য বিধবারা। বালকের ফুফু সেই কথাই মনের করিয়ে দেয়। সবচেয়ে অবহেলিত সেই কন্যারা সংসারে সমস্তভার সানন্দে কাঁধে তুলে নেয়। কিন্তু সংসার তার প্রতি মনোযোগ দেয় না।

এই বই - এর একটি জায়গা হচ্ছে পাগলের বিবরণে। এ প্রসঙ্গে জাঁ পল সার্ত্রের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ। Absurdity প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ''A gesture, an event in the little coloured world of men is never absurd except relatively speaking in relation to the accompanying the circumstances. A madman's raving, for example, are absurd in relation to the situation he finds himself, but not in relation to his madness.'' {Nausea}. এ গভীর তত্ত্ব হয়তো এ গ্রন্থে বর্ণিত পাগলদের ক্ষেত্রে খেটে যায়। তিনজন পাগলের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এই বই - এ। প্রথম জন ক্ষণস্থায়ী উন্মাদনার রোগী। সে এক বছর ভালো থাকে তো আর এক বছর পাগল হয়। আজকাল যাকে টেম্পোরাল ইনস্যানিটি বলা হয় সে রকমই। তার পাগল হবার সময়টা হচ্ছে চৈত্র বৈশাখ। সেই জন্য তাকে সমীহ করে লোকে বলত, চৈত পাগল। গাঁয়ের একমাত্র শুঁড়ি বাড়ির কর্তা শীতে শুঁড়ি হচ্ছে সেই চৈত পাগল। পাগল হয়ে গেলে আস্ফালনের চোটে সে পৃথিবী ফাটিয়ে দিত।

দ্বিতীয় পাগল চক্রবর্তীদের জামাই। ঘরজামাই সুন্দর ভদ্রলোক। তবু তাঁকে কেন বেঁধে রাখা হয় মাথায় ঢোকে না বালকের। হয়তো কোথায় চলে যাবে কিংবা জলে ডুবে মারা যাবে এই ভয়েই বেঁধে রাখা হয়। চক্রবর্তীদের বাড়ির বড় মেয়ে পুষ্পাদি স্বামীর মলমূত্র পরিষ্কার করে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকে। তার হাত ধরে। এ যেন ভাগ্যের বিধানই মেনে নেওয়া। আজ এই একবিংশ শতাব্দিতেও উন্মাদনাকে কেউ অসুখ বলে মেনে নিতে পারে না। বরং তাকে একটি চিকিৎসা নিরপেক্ষ অপূর্ণতা বলেই ধরে নেয়, যাকে আর যাই হোক সমাজে স্থান দেওয়া যায় না।

তৃতীয় পাগল একজন বৃদ্ধ। সে সবসময় চেচাঁয় আর তেড়ে যায়। সবাই তার ভয়ে তটস্ত। আর ছিল একজন খ্যাপা। সবাই তার পিছনে লাগে। ঢিল ছোঁড়ে, কাছা টেনে খুলে দেয়। সে তাতে নিজের হাতটা কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। আসলে এই পাগলের বিবরণী কেন অবতারণা বোঝা যায় না। মানুষের সমাজের অপূর্ণতার দিকেই কি তার অভিমুখ।

বাড়ির পরিবেশটা কিন্তু একটু অন্যরকম। সেখানেই ভবিষ্যৎ লেখক জীবনের ইঙ্গিত যেন। বাড়িতে লোহার চেয়ারে বসে থাকা বাবার চেহারাটা মনে রয়ে যায়। বাবার মাথার উপর আধখানা বেরিয়ে থাকা, তাল - কাঁড়ির জায়গায় একটা অব্যবহৃত ঘোড়ার জিন। বাড়িতে কখনও মানী অতিথিরা আসেন। বাড়ির ভিতর থেকে জলখাবার আসে, জগন্ময় মিত্রের, শচীন দেব বর্মনের গান ও চন্দ্রগুপ্ত পালার শিশির ভাদুড়ির গলায় চাণক্যের কথা হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গলায় ঃ শুকনো শাখার পাতা ঝরে যায়—ইত্যাদি মিলিয়ে মিশিয়ে সংস্কৃতির পরিমন্ডলটা সম্পর্কে একটা ধারণা করা যেতে পারে। অঘ্রান মাসের সকালবেলার ছায়াঘন লাল রোদ, ঘাসের ডগায়, ফুলের পাপড়িতে ধানের শিষে হিরের টুকরোর কথা দিয়েই স্মৃতিসাঙ্গ হয়। বালকের শৈশব বালকের দৃষ্টিতে রূপ পায়। তবুও একথা যেন মনে হতেই পারে যে, এই স্মৃতিকথা - ফিরে যাই ফিরে আসি - আসলে কথারম্ভ এক বিরাট কাহিনীর। তবে অভিমুখতো থাকেই, আমরা উল্লাসিত হয়ে সেই অভিমুখের দিকে চেয়ে থাকি।

কিন্তু চালচিত্রের বর্ণনায় তিনি সত্যনিষ্ঠ নিরবিচল এবং কিছুক্ষেত্রে আক্রমণাত্মক, কেন একটি সাম্প্রদায়িক সংগঠন ফতোয়া দিয়েছিল, তাঁর সত্যভাষণে তাদের কি অসহায়তা এটা যেন আমরা বুঝবার ধারণা পাই। আর একটি কথা, রাজনৈতিক এবং ট্রেডইউনিয়নের প্রথম সারি অথবা যেকোনো সারির নেতৃবৃন্দ, তা তিনি বাম, অতিবাম, দক্ষিণ অথবা মধ্যপন্থি যাই হোন না কেন - যে কোনো জনসমাগমে দারিদ্রের পরিসংখ্যান দিয়ে থাকেন বলাবাহুল্য নিজের বক্তব্য অথবা বক্তৃতাকে ঋদ্ধ করতে। আর এটা করতে কোনো কষ্ঠ

করতে হয় না। কারণ আমাদের শহরে অসংখ্য সাইবার ক্যাফে, ঘন্টা ৫টাকা। এক ঘন্টায় আপনি দারিদ্র সম্পর্কিত একটা মোক্ষম রচনা পেয়ে যাবেন, যা জনাসমাগমে আপনার নেতৃত্বের স্বীকৃতিতে একটা অন্য মাত্রা দেবে। আমাদের অভিজ্ঞতায়, এটা খুবই কষ্টকল্পনা যে, একজন লেখক অথবা বুদ্ধিজীবী শুধু মানুষের জীবনযাপন দেখতে কষ্ট স্বীকার করে নিচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের উল্লেখ করতেই হয় আর একজন চিন্তাবিদের কথা যিনি হাতে কলমে মানুষের মধ্যে থেকে কাজ করেছেন এবং কাজ করে যাচ্ছেন। পাঠক, আপনি মহম্মদ ইউনুসের - 'Banking to the poor' পড়ে নেবেন। অবশ্য তাঁর কর্মক্ষেত্র ভিন্ন। তবে একজন লেখক অথবা অর্থনীতিবিদের উদ্দেশ্যটা প্রায়শই একটু মিলে যায়, ঋদ্ধ বিশ্লেষণের তথা মানবতাবাদিতার নিরিখে।

আমরা এ আলোচনারম্ভে প্রয়াত ভাবুক শিবনারায়ণ রায়কে উদ্ধৃত করতে পারি। তিনি লিখেছিলেন, 'চালচিত্রের খুঁটিনাটি' - তে আছে বাংলার প্রকৃতি ও লোকজীবনের কয়েকটি বস্তুনিষ্ঠ স্কেচ এবং কয়েকটি স্মৃতিচিত্র। স্কেচগুলিতে যে বাংলা উদ্ঘাটিত হয়েছে তা যেমন সত্য তেমনি শিক্ষিত শহুরে পাঠকের কাছে দুঃসহ।' তিনি ১৩৯৫ সালের শ্রাবণ মাসে বিজ্ঞাপন পর্ব পত্রিকায় এই মন্তব্য করেছিলেন। বিজ্ঞাপন পর্ব একটি ছোটো পত্রিকা। আর সেই হাসান আজিজুল হককে স্বীকৃতি দিতে পেরিয়ে গেল অনেকটা সময়। এ অপ্রিয় প্রসঙ্গ দীর্ঘায়ত না করে আমরা বিষয়েই ফিরে চলি।

'চালচিত্রের খুঁটিনাটিতে' পরিব্যপ্ত হয়ে আছে স্মৃতি - সত্তা এবং অভিজ্ঞতা। এই বইয়ের রচনাগুলিকে আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটি ভাবে করা যেতে পারে, - ১) গ্রাম দর্শনের অভিজ্ঞতা - তার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে সাধারণ এবং প্রত্যন্ত মানুষের অবস্থা এবং তার পাশাপাশি প্রকাশিত বামপন্থীর ভেকধারী ক্রুরতা তথা কঠিন শোষণ, (২) সন্দীপন পত্রিকার স্মৃতি যার জন্ম খুলনায়। সুশীল সাহার ভাষায় 'বাংলাদেশের সাংস্কৃতির আন্দোলনের ইতিহাসে এ সংগঠনের ছিল একটি উজ্জ্বল ভূমিকা।' ৩) আত্মসংবৃতি এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ ৪) পরিশেষে লেখকের কৈফিয়ৎ।

নাম প্রবন্ধ শুরু হচ্ছে লেখকের সরেজমিনে গ্রাম দর্শনের কথা দিয়ে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি ছায়াবিরল রুক্ষ গ্রাম - কাঁকরভর্তি লাল মাটি সেখানে। চারিদিক ঘোলা বিবর্ণ, ধূলোটে। ঘাসপুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সাইকেলের চাকা ধূলোয় ডুবে যেতে যেতে সেই হতশ্রী গ্রামে পৌঁছনো। সেখানে মুল চরিত্র একজন মহাজনের অন্নভোগী হতদরিদ্রলোক। তার পরিশ্রমে শুখা মাটিতে সবুজ ফসল অথচ তাতে তার কোনো অংশ নেই। সেই লোকটার অ্যাপিয়ারেন্স একটা বাসি মড়ার মত। সে উত্তরাঞ্চলের চাষি। তাদের সংখ্যা কোটি কোটি। এবং তারা ভূমিহীন। হাল, বদল জমি ভিটে সর্বক্ষেত্রেই সে হীনতাপ্রযুক্ত। সে আজন্ম মহাজনের ক্রীতদাস। লেখক তার বয়স হিসাব করে দেখেন যে তার শ্রমের শুরু একেবারেই ছোটো বয়সে। তার বয়স এখন ষাট। তার একমাত্র স্মৃতি ক্ষেত্রে কাজ করা। ক্ষেত্র অবশ্য নিজের নয়, মহাজনের। তার ছেলে মেয়ে চার পাঁচটা। বেঁচে থাকলে আরো হত। এই আধুনিক বিশ্ব, এই চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা, আধুনিক জীবন এবং চিকিৎসা তার কাছে একেবারেই মূল্যহীন। এ প্রসঙ্গে আমরা One World net এ- বিবৃত তথ্যের Poverty in Bangladesh উল্লেখ করতে পারি, যেখানে বলা হয়েছে, , 'Nevertheless, with its large population and overcrowded cities, Bangladesh remains one of the poorest countries in the world. Poverty is assessed in a household income and expenditure survey held every five years. The most recent survey in 2005 found 40% of the population to be below the povecrty line, measured by the cost of essential food and basic needs, compared with 59% in 1991, the MDG baseline year. Progress has been uneven, with the most severe poverty located in urban slums and in the Chittagong Hill tracts. Just under 20% of the population falls into the cetegory of extreme poverty, locking resources to acquire a minimum dietary intake...However, poor teaching quality and the pressure of poverty have rocketed the dropout rate to a alarming 47%.' এই কঠিন প্রকৃতিকে করায়ত্ত করেছে মানুষের শ্রম। কিন্তু সেই শ্রমিক কিন্তু উপভোক্তা নয়। তার ভোগ করে কিছু মহাজন। আমাদের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা যদি এরকমভাবে দেখার চেষ্টা করতেন।

বাংলাদেশের জনপদের মনস্থিত ছবি বরেন্দ্রভূমির গ্রামে গ্রামে খুঁজে ফেরেন লেখক। কিন্তু দেখেন শুকনো খটখটে মাঠ রুক্ষ ধূলোর ন্যাংটো মাটি। প্রকাশিত হয়ে পড়ে অবিকল করোটির মত কোনো গ্রাম। আপাতদৃষ্টিতে জনহীন জনপদ মনে হলেও ভালো করে দেখলে বোঝা যায় মানুষময় সে জায়গা। বৃষ্টিতে গলে উদোম পাঁচিলের ধারে টিপ টিপ কালো শিশু। জীবনের সে প্রকাশে বরেন্দ্রভূমির প্রাকৃতিক মাধুর্য থাকে না। জীবনের স্রোত বয়ে চলে অবিরাম, কিন্তু কোনো শব্দ নেই। লেলিহান খিদের আগুনে পুড়ে ছারখার তারা। দলবদ্ধ তারা আসলে প্রাগৈতিহাসিক গুহা মানুষের দঙ্গল। তাদের ঠিক মানুষ অভিধায় নন্দিত করা যায় না। সারাদিন ঘুরে বেরিয়ে একজন দেহোপজীবীনীর মত সে শ্রম বিক্রি করতে চায়, যেদিন হয় না সেদিন মেনে নেয় সে তার অদৃষ্ট । কিন্তু তাকে পরিশ্রম করতে বলা অথবা উৎপাদন বাড়াতে বলাটা চরম নির্বুদ্ধিতা মাত্র হবে, কারণ জগতের বিকাশে তার ভূমিকা ক্রীতদাসের, অন্য কিছু নয়। কিন্তু বঞ্চনা আর অন্যায়ের মধ্যে জ্বলে ওঠার ক্ষমতাটুকুও ওর শেষ। দেশে একটার পর একটা শাসক এসেছে আর ধারাবাহিক লুঠ হয়ে গেছে। এই খানে হাসান আজিজুল হক মনে করালেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত পঙক্তিকে এবং অতিক্রম করেও গেলেন তাকে। বীরেনবাবুর বিষয় ছিল রাজার আসা যাওয়া, বিভিন্ন রঙের জামা গায়ে, বিভিন্ন মুখোশ মুখে কিন্তু তাতে দিন বদলায় না।

দারিদ্রের একটা দিক সাঁওতাল পল্লী। প্রত্যন্ত জনগোষ্ঠির খবর কেউই রাখে না বলাবাহুল্য। বরেন্দ্রভূমির কান্ট্রিসাউড। একেবোরে রুক্ষ ন্যাংটো মাঠ। তাল গাছের পাতার শব্দ। আর লালচোখো কুকুরের পাল। ভাষা অবশ্য এদের বাংলা। আর সাঁওতালত্ব বলতে কিছু বিশেষতা নেই। অনেকটা এবঙ্গেরই মত। সাঁওতাল পল্লীতে যাওয়ার উপলক্ষ অবশ্য একটা বিয়ে। আর পথ প্রদর্শক একজন সাঁওতাল ছেলে, নাম দূরবীন। বড় বিচিত্র চরিত্র। সে চোখে কম দেখে। তার এই নামটাই যেন একটা ইঙ্গিত বয়ে নিয়ে আসে, হয়ে যায় একটা সজীবন প্রতীক। স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন ছেলেটার মানস দর্শন কিন্তু চক্ষুষ্মান লোকের চেয়েও বেশি। সাধারণ মানুষ যা বুঝতে পারছে না, স্বল্প দৃষ্টি সম্পন্ন ছেলেটি খুব সহজেই তা ব্যাখ্যা করে দিচ্ছে। এ কেত্রে ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়েও তার দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী। সাঁওতাল জীবনের ইদানীংকালের মূলদিকটি আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়ে পড়ে। দূরবীনের গল্প সব সময় ক্রিয়াশীল। তাগে বারবার বকলেও তার খেয়াল থাকে না। সে পথ প্রদর্শক হয়ে চলে গ্রামের বিয়েতে। তো সেই বিয়ের ভোজ হচ্ছে খিঁচুড়ি ঘাঁটি। চাল ডাল আর মাছ দিয়ে হলে ঘাঁটি। তবে সে ঘাঁটি খেতে নিমন্ত্রণ তিনশো জন লোকের। কেউ একটা মাছের কাঁটাও পাবে না, তবে আঁশ খাচ্ছে ভেবেই শান্তি। দরিদ্রের এই হচ্ছে চেহারা। সে সম্পর্কে দূরবীন কিন্তু সচেতন। তার কথা থেকে পরিষ্কার যে সাঁওতালরা হারিয়ে ফেলেছে তার লক্ষণ, চরিত্র। এই সভ্যতাই তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে তাদের সংস্কৃতি। তারা একটি অবলুপ্তপ্রায় জাতি। ওদের বউরা আর বিয়োয় না, বাচ্চারা বাঁচে না। তবুও ওদের অতিথিকে তারা বরণ করে নেয় তাদের প্রজাতিকে সাংস্কৃতিক চেতনা থেকে। তাদের মনোরঞ্জনের জন্য নাচে সেই মাদল নাচ, পরিবেশন করে তাদের প্রিয় পানীয় হাঁড়িয়া।

এবার শোষকের প্রতীক চেহারাটা দেখে নেওয়া যেতে পারে। উত্তরবঙ্গের সাজানো বাড়ি। বন্দুকও শোভা, কারণ পাঁচশো বিঘে

জমি। তবে এই জমি রাখতে হয় কি করে - না, সরকার এই জাতীয় মানুষের। কারণ সরকারের শক্তি এরাই। তাই সরকারকেও এদের দেখতে হয় তা যতই ব্যক্তিগত জমির পরিমান বেঁধে দেওয়া হোক। কিন্তু তিনি বিপুল জমিদারির কিয়দংশ ছেড়ে দিয়েছেন কতকগুলো নিষ্প্রাণ লোকেদের জন্য। যতদিন তারা আছে তাদের কোনো পরিবর্তন নেই। মাঝে মাঝে মড়ক লেগে যায় তাদের মধ্যে। কারণ কিছুই না খাওয়া অথবা পশুর খাদ্য খাওয়া। আর আখ মাড়াই কল যেমন আখের রসটুকু ছিবড়ে নেয় তেমনিভাবে নিঙড়ে নেওয়া হচ্ছে এদের জীবনের শ্রম। আর কোথাও গিয়ে ওরা মরতে পারে না কারণ ওদের গিয়ে মরার জায়গা নেই। আসলে ঐ মানুসগুলো বাতিল হয়ে যাওয়ার বদলে বেশি আর কিছু নয়। তবুও এহেন শোষক নেহাৎই বাকচাতুর্যের জন্য বেঁচে যায় উগ্রবাদি রাজনীতির হাত থেকে।

সন্দীপনের সময় একটা উজ্জ্বল সময়। ষাটের দশকে এর প্রতিষ্ঠা খুলনায়। 'একটা ধোঁয়াটে মানবহিতৈষেণার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে 'সন্দীপন' কাজ শুরু করেছিল।' আর তাতেই সরকারের বিষ নজরে এবং সন্দীপনের প্রায় সব সদস্যকেই চরম নিগ্রহ ভোগ করতে হয়েছিল। 'নাজিম মহম্মদ, মুস্তাফিজুর তরহমান এবং তাঁদের একজন ছাত্র জহরলাল রায় একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী স্থাপনের প্রস্তাপ নিয়ে' হাসান আজিজুল হকের সহযোগিতা চান। নাজিম নাম ঠিক করেন, 'সন্দীপন'। যশোর রোডের একটি ভূতুড়ে বাড়িতে শুরু হয় 'সন্দীপন' এর কাজ। হাসান আজিজুল হক দ্বিতীয় আসর থেকে যাওয়া শুরু করেন। একটি সংস্থা চালাতে গেলে যা যা প্রয়োজন, যেমন সংবিধান রচনা, পরিচালন পর্ষৎ তৈরি করা সে সমস্তই করেছিলেন নাজিম মাহমুদ। একটি সম্প্রদায় সংগীতও রচিত হয়। তাতে সুর বসান বিখ্যাত সুরকার সাধন সরকার। বাগেরহাট কলেজের আবুবকর সিদ্দিকও যোগ দিয়েছিলেন এই আসরে। সিদ্দিকে বলেন, 'হাসান আজিজুল হকের তালতলা লেনের বাসায় বসে লিখি', জ্বালো, জ্বালো, 'আগুন জ্বালো।'

সন্দীপনের সম্পর্কে বলেছেন তিনি ঃ 'একাত্তরের একুশে মার্চ রাতে হাদিস পার্কের বিক্ষুব্ধ জনমন্ডলীর সামনে সন্দীপনের শিল্পীরা এইসব গান পরিবেশেন করে। মনে আছে, সাধন সরকার যখন দ্বিতীয় গানের অন্তরায় এসে বজ্রকণ্ঠে, 'বুলেটের বর্ষণে গর্জনে মাটি বুঝি ফেঁড়ে ফেটে যাচ্ছে।'

তিনি বলেন জীবনবাদি যে গান লেখা হয় তাতে সুর বসান সাধন সরকার। এই সন্দীপনের নেতৃত্বে যিনি এসেছিলেন তিনি নিতান্তই একজন অপরিচিত অধ্যাপক। কিন্তু মানুষটি ছিলেন খাঁটি ইস্পাতে তৈরি। এবং সন্দীপনের বলিষ্ঠ ও দুঃসাহসিক ভূমিকার পিছনে তিনিই ছিলেন মূলত। অধ্যাপকের চাকরি ছেড়ে দিয়ে একাত্তর সালে পাকিস্তানি সৈন্যের সঙ্গে লড়াইয়ে তিনি প্রাণ দেন। এছাড়া আরো অনেকেই ছিলেন এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে। এ বঙ্গের IPTA movement এর আন্দোলনের সঙ্গে সাদৃশ্য থেকে যায় অনেকটা। আবুবকর সিদ্দিকের স্মৃতিচারণায়, সলিল চৌধুরীর সুরারোপিত গানের কথাও আছে। এই সন্দীপনের আলোচনায় আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, হাসান আজিজুল হকের নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং তাঁর সমাজ মনস্কতায় এই গোষ্ঠির একটা ভূমিকা আছে যা তাঁকে সাধারণ লেখককূল থেকে আলাদা করে দেয়।

'দূরবাসী' নামে লেখাটির বিষয় ছেলের এক রাতের জন্য দেশের বাড়িতে বাবা মার কাছে আসা। বহুদূর গ্রাম...অনেকদিন আসা হয় নি। দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আধময়লা সাদা শাড়ি পড়া কোলকুঁজো মানুষটা তার মা। অনেক কষ্টে চিনতে পারেন তাকে। তার শরীরের স্পর্শ নিতে নিতে বৃদ্ধা ভেঙে পড়েন, কিন্তু ছেলের কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। তারপর বাবার সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর অবস্থাও তথৈবচ। সারা রাত মায়ের কোলের কাছে শুয়ে মনে হল আর একবার মাকে বলে সে ছোটোবেলার গল্প রূপকথার গল্প শোনাতে, কিন্তু পারে না। সে বলতে পারে না। কারণ যে নাড়িটা দিয়ে বাঁধা মায়ের সঙ্গে ছেলে, সেই বাঁধনটাই কেটে গেছে। শিবনানরায়ণ রায় বলেছেন, 'আমাকে সবচাইতে গভীরভাবে ছুঁয়েছে 'দূরবাসী' নামে লেখাটি। তিনি আরো বলেন, 'বাংলা সাহিত্যে উচ্ছ্বসিত, শ্লেষ্মা' বিজড়িত, আবেগপৃথুল, গদগদ ভাবটি বেশ প্রবল। হাসানের অনুভব এবং প্রকাশ এই ধরণের আতিশয্য থেকে অনেকটাই মুক্ত। ইউরো - আমেরিকান লেখকদের প্রধান উপজীব্য করেছেন, কিন্তু হাসান আট পৃষ্ঠার স্কেচে যে অনতিক্রম্য মানব ব্যবধানের আভাস দিয়েছেন পশ্চিম বাংলার এখনকার গল্প উপন্যাসে তার তুলনা দেখি না' (দ্রঃ বিজ্ঞাপন পর্ব - শ্রাবণ ১৩৯৫)

লেখকের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে হাসান আজিজুল হকের একেবারে সরাসরি মূল প্রশ্নে চলে যান। আমরা আগেই দেখেছি যে, তিনি লেখককে ভাড়াটে ভাঁড় ভাবতে রাজি নন। নেহাৎ মনোরঞ্জন তার কাজ নয়। সমাজে গঠনে লেখকেরও একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে যাকে উপযোগিতা বলা যেতে পারে, যদিও শব্দটিকে তিনি একরোখাভাবে ব্যবহার করতে চান। সেটাই হল মানুষের ব্যস্ততার ব্যাখ্যা। বাস্তবতা শব্দটির বিস্তৃতি বিপুল। তার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হয় পৃথিবীর মানুষের লড়াইকে। সে লড়াই আমরা আমাদের চারপাশেও দেখতে পাই। শিল্পকে তিনি পালাবার আশ্রয় বলে মনে করেন না। মোহমুক্তভাবে তিনি মানুষের বেঁচে থাকাটাকে ব্যাখ্যা করতে চান। আর যে বাস্তব তাঁর প্রস্থানভূমি সেই বাস্তবে রাঢ়ের গোরস্থান, শ্মশান - এর সঙ্গে মিশে গেছে বসন্ত - জ্যোৎস্নার মেদুরতা। তবু তিনি সেই বাস্তবের উপাসক যা ডাইনে বাঁয়ে হেলে না। মন্ত্র বা গঙ্গাজল ছিটিয়ে তার রূপান্তর সম্ভব নয়। তিনি বিশ্বাস করেন মানুষের অবিরত শ্রমে বাস্তব রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। তাই তিনি স্বীকার করে নেন যে, বাস্তবের ভিতরের জল - আগুনের গল্প লেখাছাড়া তার কোনো উপায় নেই।

কেউ একজন লিখেছেন, হাসান আজিজুলের গল্পে আছে শুধু স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি উপলব্ধি করেন, স্বপ্ন এবং বাস্তবের মধ্যে বিপুল ব্যবধান। স্বপ্ন দেখার বাস্তবটা একটু ভিন্ন। তার সঙ্গে মনের কল্পনার সম্পর্ক আছে। কিন্তু যারা শ্রম বিক্রি করতে করতে ক্রীতদাস - যারা মরণোন্মুখ জীবন যাপন করে চলেছে তাদের কাছে স্বপ্ন শুধু অসম্ভব নয়, অবান্তর। পৃথিবীর বুকে কায়িক শ্রম প্রয়োগ করে যারা ধরিত্রীকে ফলবতী করে তুলছে তাদের কিন্তু পৃথিবীর উন্নত অবস্থায় কোনো অধিকার স্বীকৃত হয় নি। হাসান আজিজুল হক সেই সত্যের মুখোমুখি হয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রতিশোধপরায়ণ রাজনীতি, উদাসীন সভ্যতা এবং অসহায় মানুষের প্রেক্ষিতে তাঁর কলম মুখর হয়ে ওঠে। তা বলে তিনি শ্লোগানমুখর সাহিত্যকে সমর্থন করেন না। ইদানীংকালে এমন অনেক শিল্পী কলাকুশলীকে দেখতে পাবেন যাঁরা শুধু স্বার্থচেতনা থেকেই সরকারের অন্যায় নীতির সঙ্গে আপোশ করে নেন। পরিবর্তে অবশ্য উপঢৌকন মেলে ঠিকই, কিন্তু ইতিহাস তাদের চিহ্নিত করে দেয়। পাঠক, আপনার কনস্তানতিন সিমোনভের কথা মনে পড়তেই পারে। একটি বহু পরিচিত বই তিনি লিখেছিলেন এবং আপনি আশেপাশে চোখ মেললেই এরকম অনেক সিমোনভের দেখা পাবেন। কিন্তু হাসান আজিজুলের অতীত, তাঁর রাজনৈতিক চিন্তা, তাঁর অকুতোভয় মন্তব্য আমাদের বিশেষভাবে ভাবায়। তিনি বলতে পারেন, 'ক্ষতবিক্ষত শরীর, রক্তাক্ত মৃত্যু কামনা করি না। কিন্তু মানুষের জন্য কাজ করতে গিয়ে তাই যদি চাপিয়ে দেওয়া হয় কি করব?' কে বলতে পারেন এরকম কথা? নিছক সখের বিপ্লবী চেতনার অথবা একটু মিছিলে ভিড় বাড়িয়ে অথবা কালো মুখোশ পরে মানুষকে তটস্থ রেখে এরকম বোধে উত্তরিত হওয়া যায় কিনা সন্দেহ। তিনি জানেন লেখকের দায়িত্বটা। তা যে সামনে চলার পথ দেখিয়ে দেয়, বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দেয় কোন পথে যেতে হবে। তিনি যদিও বলেন যে, সব লেখকের তাইই লক্ষ্য, আমরা কিন্তু বিশ্বাস রাখতে পারি না। কারণ ইতিমধ্যেই উক্ত। আমরা এই বিস্তৃত পরিসরে সেটাই বুঝতে চেষ্টা করেছি মাত্র।